

## মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে?

উপরের প্রশ্নটা শুনলেই একটু অবাক হতে পারো। মানুষ আর সমাজ এলো- মানে কী? আমরা মানুষ তো এরকমই মানুষ। সবসময়। ইতিহাস কিন্তু সেই কথা বলে না। মানুষ ও সমাজের ধীরে ধীরে বদল হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের দৈহিক ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন, কথা বলতে পারা বা লিখতে পারা, চাষাবাদ করা, শিকার করা ইত্যাদি সবকিছুই অনেক, অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। সেই পরিবর্তনের ফলেই আজ আমরা মানুষ। এই ইতিহাস কিন্তু অনেক লম্বা, লক্ষ লক্ষ বছরের। মানুষ নিয়ে আলাপ প্রসঙ্গে আমরা শুরু করতে পারি আনুমানিক ৩.৩ মিলিয়ন (প্রায় ৩৩ লক্ষ) বছর আগে থেকে। যখন মানুষের যাত্রা শুরু হলো। সেই সময়ে কিন্তু মানুষ ছিল না। অনেকে বলেন, মানুষের উদ্ভব হয়েছে নাকি বানর থেকে। এ কথা ভুল। মানুষের এই লম্বা সময়ের ইতিহাস জানার জন্য অনেক ধরনের ইতিহাসবিদ বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাদের কেউ সেই সময়কার মানুষের পূর্বপ্রজন্মের কঙ্কাল বা শরীরের হাড়গোড়ের কয়েকটা অংশ আবিষ্কার করেছেন। এই হাড়গোড়গুলো হলো জীবাশ্ম বা ফসিল। তার জীবাশ্মবিজ্ঞানী। সঙ্গে থাকে জৈবিক নৃবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, জিনতত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভাষার ইতিহাসবিদ। এমন নানা পেশার পণ্ডিতগণ অনেক বছর ধরে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন।



দুজন জীবাশ্মপ্রত্নতত্ত্ববিদ-জীবাশ্ম ইতিহাসবিদ যন্ত্র করে মানব কঙ্কালের জীবাশ্ম মাটি খুঁড়ে নথিভুক্ত করছেন। সূত্র: <https://www.discovermagazine.com/planet-earth/when-is-it-ok-for-archaeologists-to-dig-up-the-dead>



মানুষের জীবাশ্ম নিয়ে আসা হয় গবেষণাগারে। সেখানে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জীবাশ্মের বয়স, লিঙ্গ, শরীরের অঙ্গসংস্থান, জৈবরাসায়নিক, অনুজীববিজ্ঞানগত, জিনতাত্ত্বিকসহ নানা বিষয় বিশ্লেষণ করেন। (উৎস : <https://blogs.icrc.org/ir/en/icrc-in-iran/forensic-science/>)

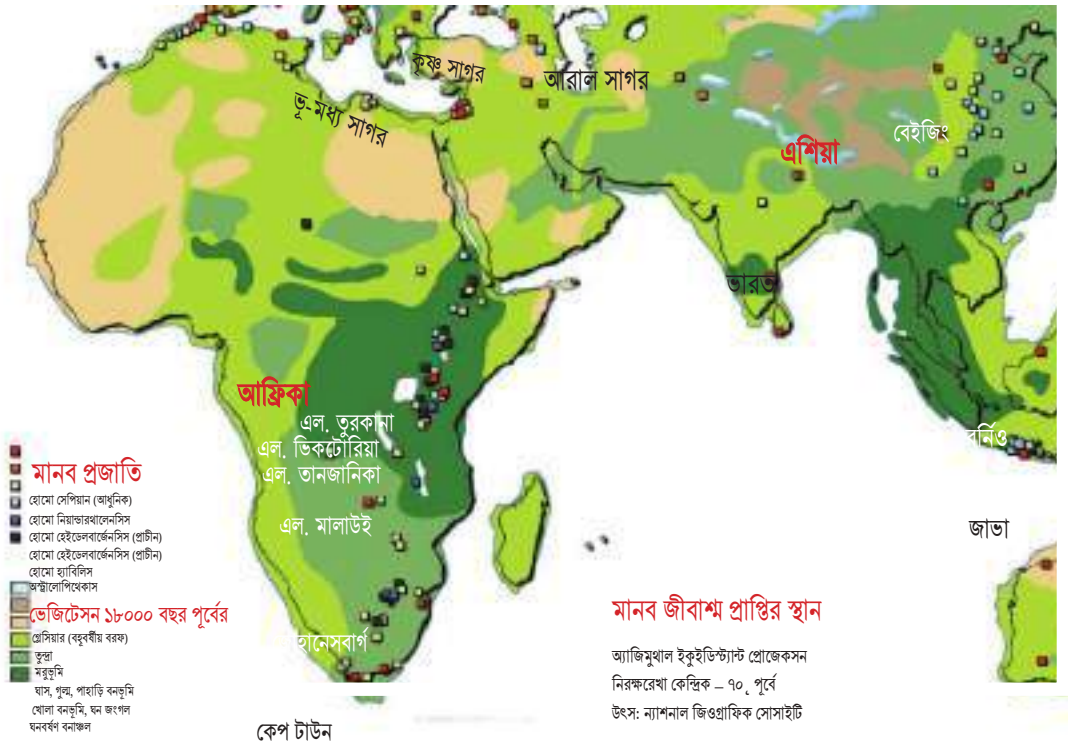


বিভিন্ন সময়ে মানুষের কঙ্কাল বা হাড়গোড় মাটির নিচ থেকে ইতিহাসবিদগণ উদ্ধার করেন। এসব হাড় হাজার হাজার বছর ধরে শক্ত হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় অনেক আর্দ্র জলবায়ুতে হাড় ক্ষয় পেতে পেতে বিলুপ্তও হয়ে যায়। পরিবেশের উপরে হাড় টিকে থাকবে কি না তা নির্ভর করে। এই ধরনের হাড় বা শরীরের টিকে থাকা অবশেষকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলা হয়।



মানুষের কঙ্কালের জীবাশ্ম বেশির ভাগ ক্ষেত্রের অংশবিশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। কেবল মাথার খুলির অংশ, চোয়ালের অংশ, মুখের হাড়ের অংশ কিংবা অন্য খন্ডাংশ খুঁজে পাওয়া যায়। এই খন্ডাংশের ওপরে ভিত্তি করেই জীবাশ্মের বয়স, লিঙ্গ, শরীরের গঠনসহ মানুষের বসবাসের পরিবেশ, চলাচল এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পুরো মানুষটির মুখ বা শরীর দেখতে কেমন ছিল তা-ও কম্পিউটারের সাহায্যে আঁকা যায়।

সেগুলো গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করেছেন। তারপরে মানুষের উদ্ভব থেকে এখন পর্যন্ত ইতিহাসকে অনেকটা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন। অনেক কিছু এখনো জানা বাকি। ইতিহাস জানা কখনো পুরোপুরি হয় না। সব সময়ই নতুন, নতুন আবিষ্কার হতে থাকে। আচ্ছা, আমাদের পূর্বপ্রজন্মের মানুষরা লক্ষ লক্ষ বছর আগে কি আসলেই বানর ছিল? নাকি পৃথিবীতে আমাদের আবির্ভাবই হয়েছে এখন যেমন আছি তেমন মানুষ হিসেবে! মানুষের আবির্ভাবের এবং পরিবর্তনের এই গল্পটা বরাবরই রহস্যময় এবং নানান প্রশ্নে জর্জরিত। কিন্তু বিভিন্ন পেশার গবেষক ও বিজ্ঞানী আর গবেষকগণের নিরন্তর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গত দশ বছরে এই রহস্যের জট অনেকটাই খুলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত অসংখ্য ফসিল বা জীবাশ্ম এই রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করেছে। কখনো শুধু দাঁত কিংবা চোয়ালের ফসিল, কখনো আবার পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত ৬০০০ এরও বেশি এমন ফসিল বা জীবাশ্ম খুঁজে বের করা হয়েছে। সেগুলো মাটির নিচ থেকে যত্ন করে তুলে এনে গবেষণাগারে রেখে বছরের পর বছর গবেষণা করে নানান প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। যদিও এখনও আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি। ইতিহাসে কখনোই শেষ কথা বলে কিছু নেই। প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। প্রশ্ন না করলে নতুন নতুন চিন্তা কীভাবে আসবে? নতুন আবিষ্কার কীভাবে হবে? এই গল্পই অনেক ছোট করে অনেক ছবিসহ তোমাদের আজ আমরা বলব।



কম্পিউটার গ্লোবাল ওয়েদার মডেল থেকে গাছপালা আনুমানিক

অস্ট্রেলিয়া

পৃথিবীর কয়েকটি স্থান যেখান থেকে মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে।



ইতিহাসে দীর্ঘসময়ের পথচলায় ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক মানব প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে। এই বিবর্তন পৃথিবীর নানা অঞ্চলে নানা সময়ে ঘটেছে।

আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে যে আধুনিক মানুষ এবং বানর-গোত্রের নানা প্রাণী (যেমন: শিম্পাঞ্জি, গরিলা) একটি সাধারণ প্রাইমেট জাতীয় প্রজাতি থেকে তাদের যাত্রা শুরু করেছে।

প্রাইমেট-জাতীয় প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে একদিকে শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং ও গিবনের মতন এপ-জাতীয় প্রাণীরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। অন্যদিকে, বানর তৈরি হয়েছে। আর একটি ধারায় মানুষ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে নানান পর্যায়ে। তোমাদের মনে রাখতে হবে, বানর বা শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষের উদ্ভব হয়নি। বরং মানুষ, শিম্পাঞ্জিসহ এপ-রা আর বানরের বিভিন্ন প্রজাতি একই ধরনের প্রাইমেট প্রজাতির প্রাণী থেকে বিকশিত হয়েছে। এই বিকাশে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লেগেছে। মানুষের এই বিবর্তন বা রূপান্তর হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। এই পরিবর্তনে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে জলবায়ুর বড় বড় পরিবর্তন। পরিবেশের বদল। গত লক্ষ লক্ষ বছরে বেশ কয়েকবার পৃথিবীর প্রায় পুরোটাই বরফে ঢেকে গিয়েছিল। এই হিমশীতল সময়কে বলা হয় বরফ যুগ বা আইস এজ। মানুষের পূর্বপ্রজন্মপলা সকল প্রজাতিকে একত্রে এপ বলা হয়।



### বরফ যুগ

২৫ লাখ বছর আগে বিশালাকার বরফের পাহাড়ে ঢাকা ছিল পৃথিবী। বরফে ঢাকা শীতল এ সময়টিকে বরফ যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিজ্ঞানীরা জানান, অ্যান্টার্কটিকার বরফ ধীরে ধীরে বাড়ছে। অ্যান্টার্কটিকায় জমতে থাকা এ বরফ সমুদ্রের ওপর ঢাকনার মতো কাজ করছে। এতে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরিত হতে পারছে না। এ বরফই নতুন করে পৃথিবীতে বরফ যুগের সূচনা করতে পারে।

গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং আর আজকের আধুনিক মানুষের পূর্ব প্রজন্মগুলো (যেমন: অস্ট্রালোপিথেকাস প্রজাতির নানা প্রাণী)।

জীবশাস্ত্র থেকে যদি বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি এবং মানুষের আগের প্রজাতি মুখায়ব আঁকা হয় তাহলে তাদের পূর্বপুরুষদের চেহারা কেমন হয়? বড় হয়ে এসব বিষয়ে তোমরা আরও অনেক কিছু পড়বে। তবে মজার বিষয় হল, এপুদের থেকে মানুষের বিবর্তন ধীরে ধীরে হয়েছে। আধুনিক মানুষে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে শরীরের অনেক কিছু বদল ঘটেছে। প্রধান বদল ঘটেছে হাঁটার ধরনে, হাত দিয়ে কোনো জিনিস ধরার ভঙ্গিতে, মাথার আকারে, মুখমণ্ডলের বদলে। এই বদল তোমরা এই অধ্যায়ের ছবিগুলো বা ইন্টারনেট থেকে মানুষের পরিবর্তনের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। মানুষ হয়ে ওঠার সবচাইতে বড় বদল হলো ‘দুই পায়ে সোজা হয়ে হাঁটতে পারা।’ প্রাইমেটরা দুই পায়ে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটে। কখনও কখনও চার পায়েও হাটে। কোনো জিনিস ধরে ঠিকঠাক ব্যবহার করা (যেমন: কাটাকুটি করা, আঘাত করে কোনো কিছু ছেঁচা, শক্ত করে ধরে ছুড়ে মারা ইত্যাদি) যত ভালোভাবে পেরেছে, ততই মানুষ হয়ে উঠেছে। হাতের মুঠো করা আর হাতকে নানা কাজে ব্যবহার করতে পারাও মানুষের একটা বড় লক্ষণ। মাথার আকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুই পায়ে সোজা হয়ে হাঁটা বা দৌড়ানো, কোনো কিছুকে দৌড়ে ধরে ফেলা এবং বুদ্ধির ব্যবহার করতে পারার সম্পর্ক ছিল।

হাত ও হাতের মুঠোর ব্যবহার যতো ভালো হয়েছে, ততোই মানুষ তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে ভালোভাবে। চারপাশের গাছের ফলমূল সংগ্রহ করা, প্রাণী শিকার করা, পাথর, গাছের ডাল ও অন্য প্রাণীর হাড় দিয়ে নানান ধরনের হাতিয়ার তৈরি করতে পেরেছে। আধুনিক মানব প্রজাতি বা হোমো সেপিয়েন্সদের সঙ্গে আগের প্রজাতিগুলোর আরেকটা ফারাক খুলির বা করোটির আকার, গঠন আর মগজের পরিমাপে। হাতের মুঠো ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করায় আধুনিক মানব প্রজাতি চারপাশের বিভিন্ন বস্তুকে ব্যবহার বা পরিবর্তন করার সামর্থ্য অর্জন করে। চারপাশের পাথর, গাছের ডাল ও বাকল, প্রাণীদের হাড় ও চামড়া সংগ্রহ করা, পরিবর্তন করা এবং নানা কাজে ব্যবহার করতে শেখে ধীরে ধীরে। পাথর বা কাঠ বা হাড় দিয়ে নানা কাজের জন্য হাতিয়ার বানানো শিখতে পারাটা এই প্রজাতির মানুষের বিকাশের প্রথম পর্যায়ের বড় অর্জন।

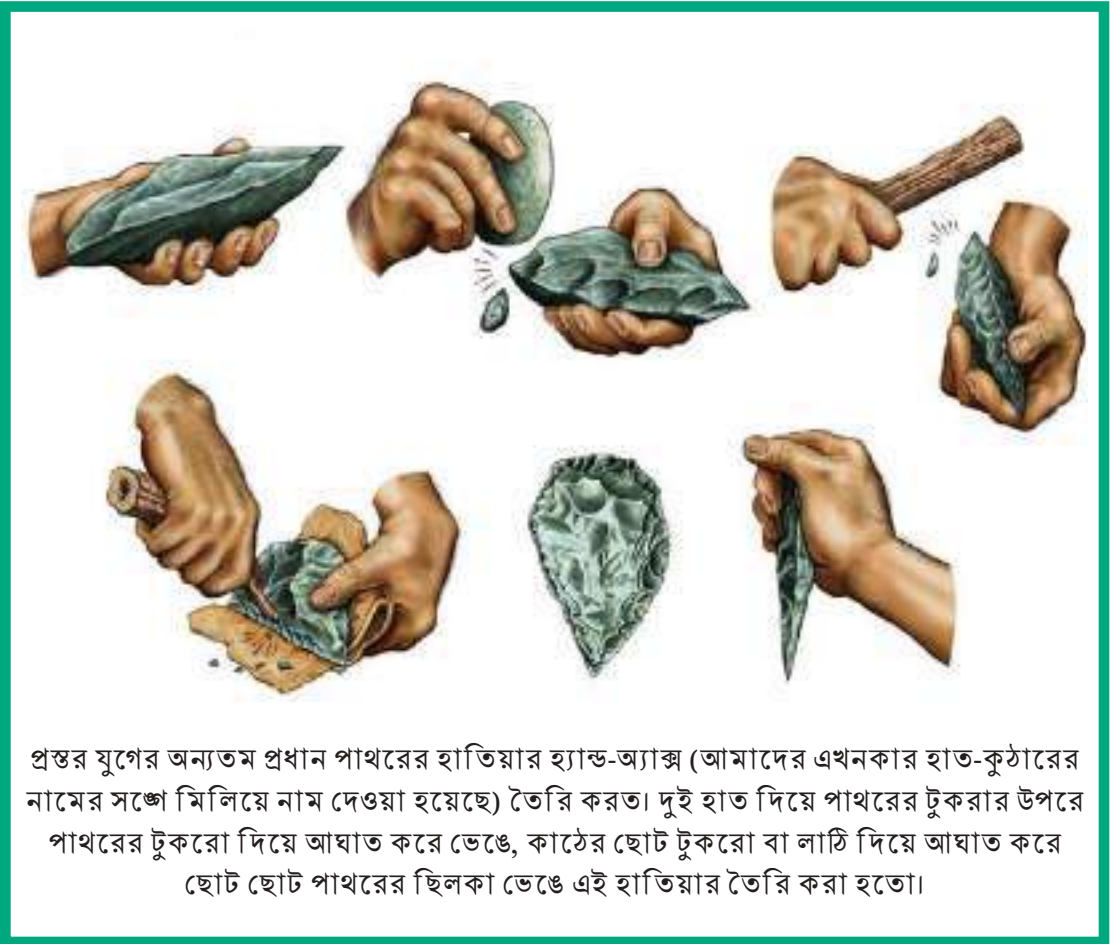
অনেকগুলো মানুষের আর হোমিনিডের প্রজাতি কিন্তু একসঙ্গেও বসবাস করেছে। একটা জিনিস জানা খুব জরুরি। মানুষের আগের প্রজন্মগুলোর বেশির ভাগের উৎপত্তি হয়েছে বর্তমান আফ্রিকা মহাদেশে। হোমো প্রজাতির সবচেয়ে পুরোনো প্রজাতিরও বিকাশ ঘটেছিল আফ্রিকায় আনুমানিক ২৪ লক্ষ বছর আগে। তারা হোমো হ্যাবিলিস নামে পরিচিত। পরে প্রায় ১৯ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেকটাস নামের আরেকটি প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। একই সময়ে হোমো রুডোলফেনসিস নামের আরেকটি প্রজাতির উদ্ভবও ঘটে আফ্রিকায়। আরও অনেক পরে প্রায় চার লক্ষ বছর আগে হোমো নিয়ানডারথালেনথিস প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। আর আমরা, মানে, হোমো সেপিয়েন্সদের উদ্ভব ঘটে প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে। বর্তমান রাশিয়ার সাইবেরিয়ার একটি গুহায় কয়েক টুকরা ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে জানতে পারেন, সেটি একটি ১৩ বছর বয়সের মেয়ের ফসিল। বাচ্চাটি সেপিয়েন্সও না, নিয়ানডারথালও না। বাচ্চাটি নতুন একটি প্রজাতির। এই প্রজাতির নাম দেওয়া হয়েছে ডেনিসোভিয়ান। মেয়েটির নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন ড্যানি।

এসব হোমো প্রজাতির মধ্যে কেবল হোমো সেপিয়েন্স বা আমরাই টিকে গেছি। বাকিরা নানা কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না-পারা, অন্য প্রজাতিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে ওঠাসহ নানা কারণে নিয়ানডারথাল ও ডেনিসোভিয়ানরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন

প্রজাতিই আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে বংশবিস্তার করে। ইউরোপ, এশিয়ার বিভিন্ন অংশ হয়ে ভারত উপমহাদেশ পার হয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। একটি অংশ চীন হয়েও আরও পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আরেকটি দল দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

বিভিন্ন জায়গার ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণীসহ জলবায়ু বিভিন্ন রকম হওয়ায় বিভিন্ন প্রজাতিকেই একেকটি নতুন নতুন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। নতুন নতুন হাতিয়ার ও হাতিয়ার তৈরির কৌশল খুঁজে বের করতে হয়েছে। নতুন নতুন খাদ্যাভ্যাস আর আচার-আচরণ রপ্ত করতে হয়েছে। মোটামুটিভাবে পাথরের হাতিয়ার তৈরির কৌশল শেখার সময় থেকেই আমরা প্রাগিতিহাসের শুরু বলে মনে করি। প্রায় ৩৩ লক্ষ বছর আগে প্রাইমেট গোত্রীয়রা সর্বপ্রথম পাথরের হাতিয়ার তৈরি করে ছোট ছোট কাজ করা শেখে।

হোমো প্রজাতিগুলো পাথরের হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার করতে পারত। একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকত। গুহায় বসবাস করত। শিকার করতে বা ফলমূল সংগ্রহ করতে পারত। একেকটি দল যখন একত্রে একটা স্থান থেকে দূরের আরেকটা স্থানে যেত, তখন তাদের মধ্যে একধরনের আত্মীয়তা ও গোত্রের ধারণা তৈরি হয়। আমরা এখন





মানুষ বসে এভাবেই পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করত প্রস্তর যুগে।





ক



খ



গ



ক) আফ্রিকা মহাদেশ ছিল মানব বিবর্তনের প্রধান কেন্দ্র। পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ ও মানুষের আদি-প্রজাতিগুলোর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পূর্ব আফ্রিকায়

খ) পাথরের বিভিন্ন স্তর থেকে জীবাশ্মগুলো পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চুনাপাথরের গুহা থেকে ফসিলগুলো পাওয়া গেছে

গ)। আফ্রিকা থেকে পরে বিভিন্ন সময়ে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে (এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে মানুষের এই যাতায়াতের অভিযান বলা হয়)।



প্রাগৈতিহাসের সময়ে মানুষের জ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানুষের সমাজ ও আচার-আচরণ এবং মানুষের জীবনযাপনের ধরনের বদল নিয়ে সংক্ষেপে আলাপ করব।

আমরা তো দেখলাম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি কীভাবে আদি অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বর্তমান মানুষে পরিবর্তিত হয়েছে। তোমরা কি জানো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানও একই ভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার রূপ বদলে চলেছে। এদের সৃষ্টি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে থাকলে পৃথিবীর রূপ হয়ে ওঠে আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট অর্থাৎ বলা যেতে পারে আমরা আরও ভালোভাবে চিনতে শুরু করি পৃথিবীর-ভূমিরূপসমূহ। তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে সেসব প্রক্রিয়া! আমরাও সেগুলো ধাপে ধাপে জানার চেষ্টা করব।

পৃথিবী যখন প্রথম সৃষ্টি হলো, তখন এটি প্রচণ্ড উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল, তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়েও বেশি। কোনো বাতাস ছিল না, ছিল শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং জলীয় বাষ্প। পৃথিবী ছিল বিষাক্ত। এই নতুন গ্রহটি ছিল গলিত পাথর এবং লাভার সমুদ্র।

তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর পরিবর্তন হতে হতে বর্তমান অবস্থার রূপ নিয়েছে। ঠিক যেন আমাদের মতো তা-ই না! চলো এবার দেখে নিই এখন থেকে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন বছর আগে থেকে ২০ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে কেমন সব পরিবর্তন এলো—প্রথমে তো পৃথিবীজুড়ে সমুদ্রই ছিল এবার তাহলে জানা যাক ভূমি কীভাবে এলো—পৃথিবীর জন্মের প্রায় ১.২ বিলিয়ন বছর পর পৃথিবীর অনেক ভেতরে যে গলিত ও অর্ধ-গলিত বস্তু আছে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে পানির নিচের ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে এবং আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। আগ্নেয়গিরির লাভা পুরো সমুদ্রে ছড়িয়ে গিয়ে আগ্নেয় দ্বীপ সৃষ্টি হয়। এই আগ্নেয় দ্বীপ পরে সংযুক্ত হয়ে পৃথিবীর প্রথম মহাদেশ গঠিত হয়। প্রথম মহাদেশ তৈরি হবার পর এক বিলিয়ন বছর তেমন কিছুই হয়নি পৃথিবীতে। একেবারে একঘেয়ে একটা সময় গেছে। মহাদেশগুলো আটকে ছিল একটা ট্রাফিক জ্যামে অর্থাৎ তেমন একটা নড়াচড়া করেনি। প্রাণের তেমন কোনো উন্নতিও ঘটেনি এ সময়ে। একে ভূবিজ্ঞানীরা বলেন মহা-মহাদেশ। মহা-মহাদেশের মাঝে একটা হলো প্যানগায়া। পরবর্তী সময়ে প্যানগায়ার মাধ্যমে অখণ্ড মহাদেশটি বিভক্ত হয়ে তৈরি করে অনেকগুলো মহাদেশ।



৬০০ মিলিয়ন বছর আগে



৪০০ মিলিয়ন বছর আগে



২০০ মিলিয়ন বছর আগে

এবার তোমরা এতক্ষণ যা পড়েছ, সেই ঘটনাগুলো একটি পৃষ্ঠায় এনে দেখার চেষ্টা করা যাক।

- ক. প্রথমে তোমরা মানুষের গল্পের শুরুর ৩.৩ মিলিয়ন (৩৩ লক্ষ) বছর থেকে শুরু করে এখন থেকে ৩ লক্ষ বছর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিবর্তনের কথা তোমরা যা জেনেছ, তার একটি তালিকা করবে।
- খ. এবার তোমরা উপরের নমুনা অনুসারে একটি স্কেল বা রুলার আঁকবে। মনে রাখবে, তোমরা স্কেলে ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারে দাগ থাকবে না। দাগ হবে মিলিয়ন বছরের হিসাবে।
- গ. একেকটা দাগ ০.৫ মিলিয়ন (৫ লক্ষ) বছরের হিসেবে।
- ঘ. তোমরা চারটি কালের (৩.৩, ২.৪, ১.৯ এবং ০.৩ মিলিয়ন বছর আগের) চিহ্নিত করবে। নমুনার মতো করে অথবা তোমার যেভাবে ভালো লাগে স্কেলের মাধ্যমে ঘটনার মূল বিষয় উপস্থাপন করবে।
- ঙ. তোমার আঁকা বা সংগ্রহ করা ছবিও ছোট ছোট করে কেটে সাজাতে পারো।

### ১ম ছবি পূর্বে

প্যানগিয়া- ইউরেশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অ্যান্টার্কটিকা, অস্ট্রেলিয়া, টেথিস মহাসাগর

### ২য় ছবি পরে

উত্তর মহাসাগর, উত্তর আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ আমেরিকা, আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর, ইউরেশিয়া, আফ্রিকা, ভারত মহাসাগর, অ্যান্টার্কটিকা

এরপর একটি মহাদেশ অন্যটির সঙ্গে ধাক্কা লাগছিল, এর ফলে যেমন তারা পরস্পরের থেকে দূরে যাচ্ছিল, তেমনই সৃষ্টি হচ্ছিল নানা ভূমিরূপ। কখনও মহাসাগর তো কখনও সুবিশাল পর্বতমালা। একদিকে এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট, তেমনি অপরদিকে গভীরতম খাত-মারিয়ানা। একদিকে আমেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গিরিখাত তো আর একদিকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বৃহৎ ব-দ্বীপ সমভূমি।



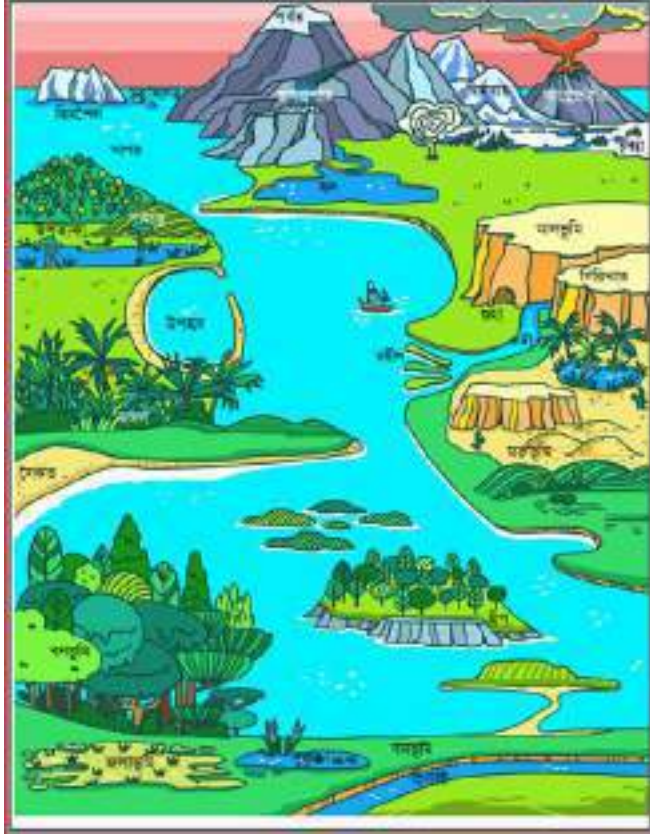
১০০ মিলিয়ন বছর আগে



৫০ মিলিয়ন বছর আগে



২০ মিলিয়ন বছর আগে



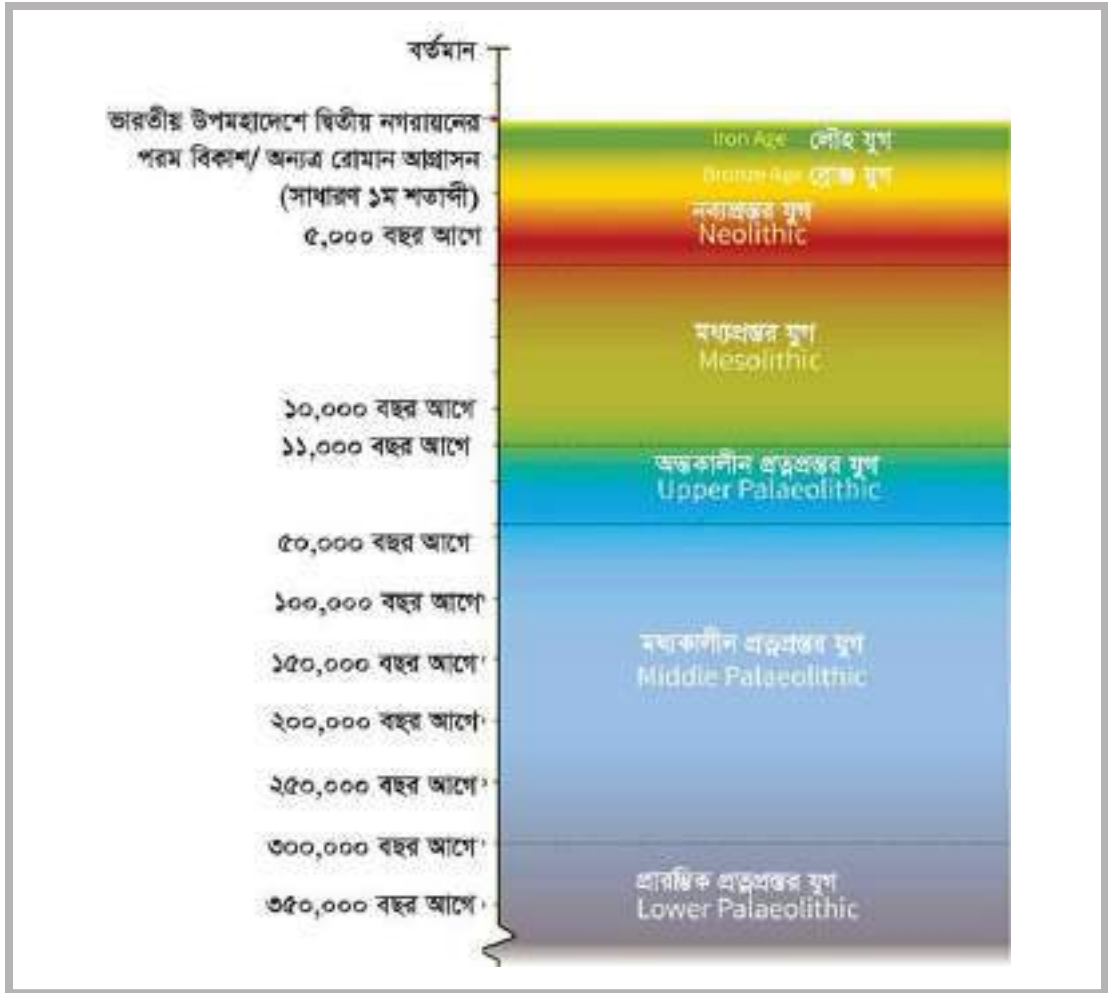
### মানুষের প্রাগিতিহাস আর মানুষ হয়ে ওঠার আশ্চর্য কাহিনি

কীভাবে ইতিহাস জানা যায় আর সেই ইতিহাসে কীভাবে সময়কে বিভিন্ন যুগে শ্রেণিবিভক্ত করা হয় তা আমরা প্রথম অধ্যায়ে জেনেছি। মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যেমন দৈহিক বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে, ঠিক তেমনি মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এই পরিবর্তন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একই সময়ে ঘটেনি।

মানুষ যেমন আফ্রিকা মহাদেশে আবির্ভূত হয়ে পরে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, বসবাস করেছে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েছে। মানুষের এই ছড়িয়ে পড়াকে বলে মানুষের অভিবাসন। প্রাগিতিহাসের সময়ে এই অভিবাসন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। মানুষ হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে। প্রাগিতিহাসকে আগে তিনটি যুগে ভাগ করা হতো: পাথরের যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ এবং লৌহ যুগ। মানুষ কোন ধরনের উপাদান হাতিয়ার নির্মাণের জন্য ব্যবহার করছে তার ওপরে ভিত্তি করে এই যুগবিভাজন হয়েছিল। পরে বিজ্ঞানীরা নতুন করে যুগবিভাজন বা সময়কে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করেন। প্রস্তর যুগকে ভাগ করা হয় প্রধানত তিনটি যুগে— প্রত্নপ্রস্তর বা পুরোপলীয় যুগ, মধ্যপ্রস্তর যুগ এবং নিম্নপ্রস্তর বা নবোপলীয় যুগ। প্রত্নপ্রস্তর বা পুরোপলীয় যুগকে আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়: উচ্চপ্রত্নপ্রস্তর যুগ, মধ্যপ্রত্নপ্রস্তর যুগ আর নিম্নপ্রত্নপ্রস্তর যুগ। পরের যুগটিকে বলা হয় তাম্রপ্রস্তরযুগ। এই যুগে তামা ও পাথর মানুষ একই সঙ্গে ব্যবহার করত। বিভিন্ন যুগেই পাথরের পাশাপাশি মানুষ কাঠ বা গাছ, হাড়সহ নানা উপকরণ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছে। পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করার ক্ষেত্রে মানুষ ধীরে ধীরে ধীরে নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার

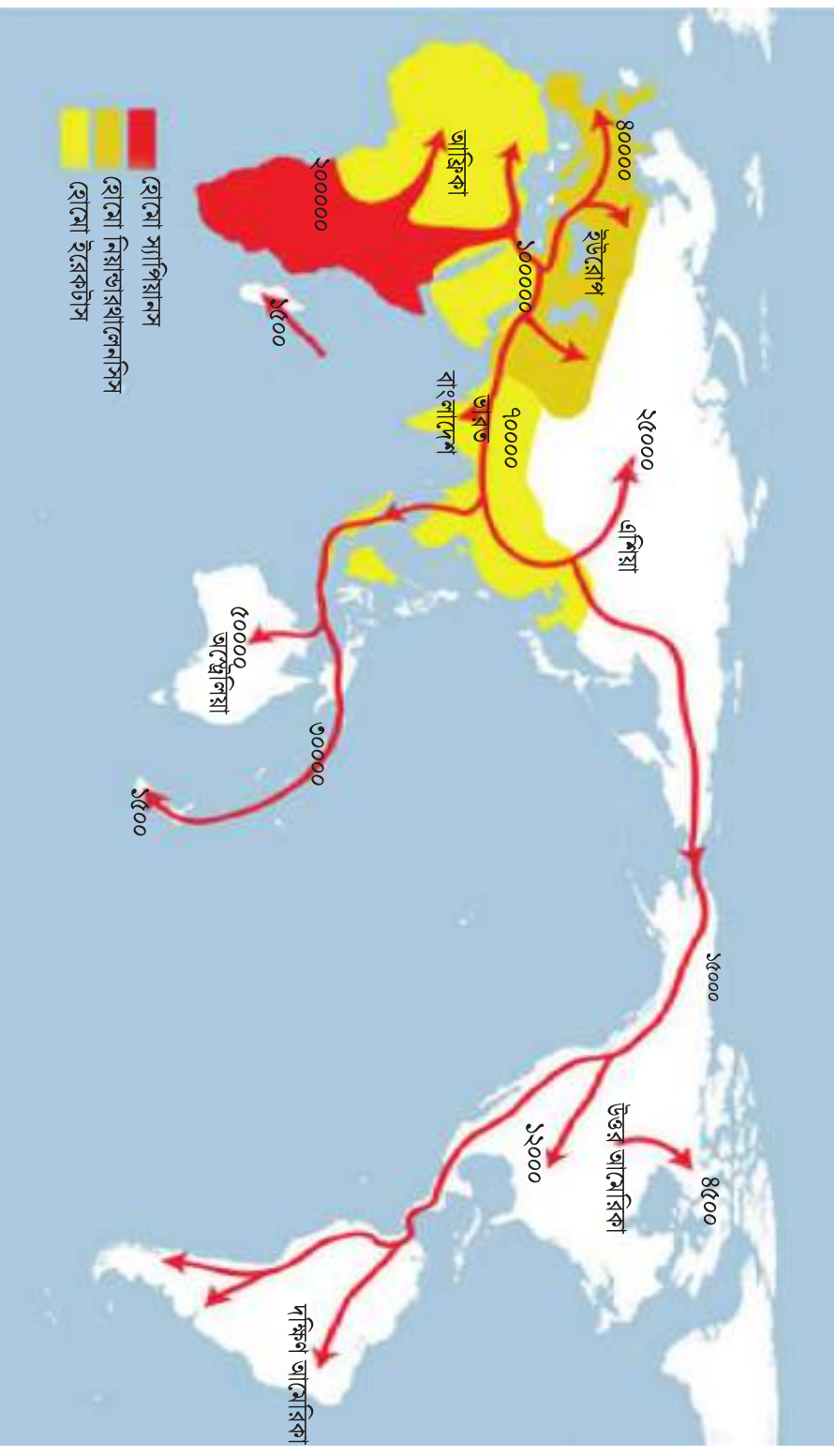


করেছে। এর পাশাপাশি মানুষের জীবন, খাদ্য সংগ্রহের ধরন, সমাজের ধরন পাণ্টেছে। নিচের ছবিগুলোতে এই যুগবিভাজন সম্পর্কে ধারণা পাবে।



### প্রাগৈতিহাসের বিভিন্ন পর্ব ও সময়কাল

প্রস্তর যুগ থেকে লৌহযুগের বিভিন্ন পর্বের সময়কাল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একই ভাবে এই প্রস্তর যুগ থেকে লৌহ যুগের আবির্ভাব ঘটেনি। তাই কোনো স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রেখা দিয়ে এই কালানুক্রম বা সময়ের ক্রমকে আলাদা করা যায় না। মানুষের আফ্রিকায় উদ্ভব হওয়ার পরে প্রথম পর্যায়ে তারা আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত প্রাকৃতিক ও জলবায়ুগত কারণে। পরে জলবায়ুর বিভিন্ন বদল, বিশেষ করে বরফ যুগের আবির্ভাব এবং শিকার-সংগ্রহের উৎসের অপ্রতুলতাসহ নানা কারণে তারা আফ্রিকার বাইরে ইউরোপ ও এশিয়া হয়ে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়েছিল হোমো নামের প্রজাতিগুলোর বিকাশের আগেই। পরে বিভিন্ন সময়ে দলে দলে মানুষ আফ্রিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠার মানচিত্রে এই অভিবাসনের একটি ধারণা তোমরা পাবে:



## অভিবাসন যুগে যুগে

**কাজের নির্দেশনা:** একেক দলে পাঁচজন করে শিক্ষার্থী কয়েকটি দলে নিচের কাজটি করবে। প্রথমে দলের সকলে নিজে নিজে নিচের কাজটি করবে। তারপর সকলে নিজ নিজ দলে বসে আলোচনা করে সবার লেখা মিলিয়ে একটি লেখা উপস্থাপন করবে। তারপর একটি দল অন্য সকল দলের কাজের উপর নিজেদের মূল্যায়নমূলক মতামত বলবে।

**কাজের বর্ণনা:** মনে করো, তোমার পরিবার-পরিজনদের কিংবা তোমার পরিচিতদের মধ্যে কেউ একজন বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনো দূর দেশে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। তিনি হয়তো চাকুরির উদ্দেশ্য বা আরও উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য গিয়েছিলেন। তিনি এখন আর বাংলাদেশের নাগরিক নন। কিন্তু তাঁর হয়তো বাংলাদেশ যাওয়া-আসা আছে। যে দেশে তিনি বাস করেন, সেখানে অন্যান্য বাংলাদেশি বা অন্যান্য এশিয়ান নিয়ে একটা সামাজিক পরিবেশে তিনি বাস করেন। তারা হলেন এ-কালের অভিবাসী। তোমাদের বইতে প্রাচীনকালে অভিবাসনের মাধ্যমে মানব প্রজাতির আফ্রিকা মহাদেশ থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার কাহিনি বলা হয়েছে। সেই অভিবাসনের সঙ্গে এই অভিবাসনের তুলনা করে পাঁচটি মিল ও পাঁচটি অমিল খুঁজে বের করো।

## প্রত্নপ্রস্তর যুগে মানুষের হাতিয়ার ও জীবনযাপন

মানুষ প্রত্নপ্রস্তরযুগে পাথর ভেঙে, ঘষে, ছোট ছোট টুকরা করে ব্যবহার করেছে নানা কাজে। নিম্নপ্রত্নপ্রস্তর যুগ ও উচ্চপ্রত্নপ্রস্তর যুগের ব্যাপ্তি অনেক বেশি ছিল। প্রথম মানুষ যখন পাথর পরিকল্পিতভাবে ভাঙার কৌশল শিখলোআর সেই কৌশল প্রয়োগ করে পাথরকে ভেঙে ভেঙে নানান আকৃতি দেওয়া শুরু করল তখনই প্রস্তর যুগের সূচনা। তবে এই যুগগুলোতে কিন্তু তখনো হোমো-প্রজাতির মানুষের উদ্ভব ঘটেনি। মানুষকে নিরন্তর প্রতিকূল প্রকৃতি, বন্য হিংস্র জীবজন্তুসহ নানাধরনের পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। যেখানে তখন যাযাবরের মতন এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। আফ্রিকার বাইরে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে এসময়েও মানুষ ছড়িয়ে পড়ে। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মানুষ শিকার করত। ফলমূল সংগ্রহ করত। এই সময়ের মানুষের সেরা আবিষ্কার হলো পাথর ভেঙে ভেঙে একটি হাতিয়ার তৈরি করা যাকে বিজ্ঞানীরা হ্যান্ড-অ্যাক্স বা হাত-কুঠার নামে ডাকেন। আমাদের পরিচিত এখনকার কুঠারের সঙ্গে এই কুঠারের কোনো মিলই কিন্তু নেই। এই হাতিয়ার কিন্তু মানুষের বিভিন্ন ধরনের প্রাণী শিকার করার, ফলমূল ছেঁচার, কোনো কিছুকে কাটায় সমর্থ করে তুলেছিল। নিম্নপ্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে অথবা মধ্যপ্রত্নপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকে মানুষ দ্বিতীয় বড় আবিষ্কার করে। নিজে নিজে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে আগুন জ্বালাতে ও আগুন ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। আগুনের আবিষ্কার মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। খাবারদাবার রান্না করা কিংবা কোনো কিছু পোড়ানো বা গরম করা, আগুন জ্বালিয়ে শীত থেকে রক্ষা পাওয়াসহ নানা রকমের সুবিধা পাওয়া শুরু হয়।



মানুষের ইতিহাসের প্রথম বড় আবিষ্কার: পাথর ভেঙে তৈরি করা অ্যাসিউলিয়ান হ্যান্ড-অ্যাক্স



প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের বৈচিত্র্য আর ব্যবহারের বিভিন্নতা





আলতামিরার গুহায় উচ্চপ্রত্নতত্ত্ব যুগের মানুষদের ঐক্য বাইসনের বিখ্যাত চিত্র



মানুষের দৈনন্দিন দলবদ্ধ জীবনের কাল্পনিক ছবি।



প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের বসতি ও কাজের কাল্পনিক চিত্র

বরফ যুগের প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের  
হাতি (নাম ছিল ম্যামথ) শিকারের  
কাল্পনিক চিত্র।





উচ্চ প্রভুপ্রস্তর যুগে পাথরের হাতিয়ার ছোট হতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই সময়ে মানুষ শিকার ও সংগ্রহের জন্য অনেক বেশি উপযুক্ত হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়। দৈনন্দিন নানান কাজে পাথর, হাড়, বা কাঠের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করা শুরু করে। তার মানে হলো, আগের তুলনায় মানুষের শিকার করার ও খাদ্য গ্রহণ করার বৈচিত্র্য তৈরি হয়। মানুষ দলবদ্ধভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলাচল করত। এ সময়ে এই গোষ্ঠীগুলোর চলাফেরার বিস্তৃতি বাড়ে। সাময়িকভাবে খোলা স্থানে ছাউনি বা আবাসন তৈরি করাও শুরু করে। এই গোষ্ঠীগুলোই নিজেদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে গোত্র সৃষ্টি করে পরবর্তী সময়ে। সেখান থেকেই পরিবারের ধারণা তৈরি হয়। এই যুগের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো মানুষের শিল্পদক্ষতার পূর্ণ-প্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন স্থানের গুহার মধ্যে মানুষ হাতে আঁকা অসাধারণ সব দৃশ্য ও দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকে। এই গুহাচিত্রগুলোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়। মানুষ বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই যুগেই নিয়ানডারথাল, ডেনোসোভিয়ান আর আধুনিক মানুষ, সেপিয়েন্স প্রজাতির মানুষের উদ্ভব ঘটে।

সময়ের ধারাবাহিকতায়ই প্রায় ১০-১২ হাজার বছর আগে একটা বরফ যুগের পরের তুলনামূলক উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়াজুড়ে বিরাজ করা শুরু করে। মানুষ তখন আরও বড় এলাকাজুড়ে ঘুরে বেড়ানো, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী শিকার করা, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ আর তৈরি করার সামর্থ্য অর্জন করে। পাথরের হাতিয়ারগুলো ছোট হয়ে যায়। সেই হাতিয়ারগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য বাড়ে অনেক। তীর-ধনুক, বর্শাসহ নানা প্রকারের হাতিয়ার ব্যবহৃত হওয়া শুরু করে। এই যুগকেই বলে মধ্যপ্রস্তর যুগ। ছোট ছোট পাথরের বা হাড়ের হাতিয়ার ব্যবহার করার কারণে এই সময়কে ছোট পাথরের যুগও বলা হয়। মানুষ এই সময়ে কবর দেওয়ার প্রথা শুরু করে। পরিবারের একধরনের প্রাথমিক গড়ন তৈরি হয়। মানুষ পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল ভূমিতে আর নদী বা হ্রদের



প্রস্তরযুগ ও ধাতুর যুগের মানুষের তৈরি করা, ব্যবহার করা বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন। এখানে পাথরের, কাঠের, ধাতুর, ঝিনুকের, মাটির বিভিন্ন ধরনের বস্তুর ছবি রয়েছে।



হাড়ের তৈরি বড়শি



নারী শিকারির হরিণ শিকারের কাল্পনিক দৃশ্য। আবিষ্কৃত প্রমাণের ভিত্তিতে আঁকা হয়েছে।





প্রস্তর যুগের একটি বসতিতে মানুষ কী কী কাজ করছে? তুমি দেখে একটা তালিকা করতে পারবে?

পাড়ে সাময়িকভাবে বসতি তৈরি করা শুরু করে। এই সময়ের শেষের দিকে ছোট ছোট আকারে জুম চাষের মতন কৃষিকাজ মানুষ আয়ত্ত করে। তার মানে হলো, এতকাল মানুষ প্রাকৃতিক ভাবে জন্মানো গাছ, শস্য ও ফলমূলের উপরেই নির্ভর করত। বন্য উদ্ভিদ ও শস্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত। এখন মানুষ ধীরে ধীরে বিভিন্ন শস্য বাছাই করে নিয়ন্ত্রিতভাবে চাষাবাদ শুরু করে। মানুষের হাতে বানানো বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্রও বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে মধ্যপ্রস্তরযুগের। এই যুগের পরে আসে মানুষের জীবনে ও ইতিহাসে প্রথম বিরাট বদল। এই বদল ঘটে যে যুগে সেই যুগকে নাম দেওয়া হয়েছে নব্যপ্রস্তর যুগ বা নতুন পাথরের যুগ।



প্রস্তর যুগের মানুষের মাছ শিকারের কাল্পনিক ছবি



বরফযুগে মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের বসতি ও প্রাণী শিকার করে মাংস রান্না।

## মানুষের ইতিহাসে প্রথম বড় বদল: নব্যপ্রস্তর যুগ

নতুন পাথরের যুগ বা নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষ এমন কী কী করেছিল যা মানুষের জীবনে, সমাজে আর চিন্তায় এমন বিরাট সকল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। বিজ্ঞানীরা এই বদলের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। হাতিয়ারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ বিচিত্র ও নানাধরনের উপাদানের ব্যবহার করা শুরু করেছিল। বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি করেছিল।

এই যুগেই মানুষ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিতভাবে পছন্দমতন শস্য ও উদ্ভিদের চাষাবাদ করা শুরু করে। ফলে এতদিন যেভাবে মানুষকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো, তার অবসান ঘটে অনেক ক্ষেত্রে। স্থায়ীভাবে মানুষ বসবাস করা শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের পশু পালন করাও রপ্ত করে। গবাদি পশু থেকে শুরু করে শিকার করায় সহযোগিতা করার জন্য কুকুরের মতন প্রাণী বা ঘোড়াও পোষ মানায়। পরিণতিতে মানুষের গ্রাম বা প্রায় শহরের মতন বসতিও গড়ে ওঠে নানা স্থানে।



নব্যপ্রস্তর যুগে কাঠ ও বেত দিয়ে তৈরি করা ছোট লাঙল



নব্যপ্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি নানা ধরনের নিদর্শন ও হাতিয়ার



নব্যপ্রস্তর যুগের একটি বসতির কাছে জমি থেকে নারী ও পুরুষরা যৌথভাবে ফসল কাটছেন। পেছনে বসতির ঘর। এই ঘরগুলোর বৈশিষ্ট্য কী?



নব্যপ্রস্তর যুগের বসতির কাল্পনিক ছবি। কে কোন কাজ করছে সেটা ছবি দেখে বলতে পারবে? এই বসতিটি কোন ধরনের ভূমিরূপে অবস্থিত? ঘরগুলোর আকার কেমন?



তুরস্কের গোব্যাকলি টেপের সবচেয়ে পুরোনো স্থাপত্যের ধংশাবশেষ, নব্যপ্রস্তর যুগের।





নব্যপ্রস্তর যুগের একটি প্রাচীরঘেরা বসতির ঘর, মানুষের কাজ, আর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কাজ করার কাল্পনিক চিত্র।

ভারত উপমহাদেশে নব্যপ্রস্তর যুগের সূচনা ধরা হয় আনুমানিক সাধারণ সপ্তম সহস্র পূর্বাব্দে। কৃষিকাজের কারণে নানান স্থানে ও গুহায় স্থায়ী গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠে। গম, যব, বার্লির চাষাবাদ শুরু হয়। বন্য প্রজাতির ধানের চাষাবাদেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে সাধারণ সপ্তম সহস্রপূর্বাব্দে। গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের গঠন হতে শুরু করে। বিভিন্ন গোত্র ও বংশধারা গড়ে ওঠে। এক বসতির লোকজনের সঙ্গে আরেক বসতির লোকজনের ব্যবসা ও বিনিময়ও শুরু হয়।

বর্তমানে পাকিস্তানের মেহেরগড় নামের একটি স্থানে নব্যপ্রস্তর যুগের যে বসতির প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই বসতিই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে একসময় সভ্যতার পত্তন ঘটায়। আমরা পরে সেই সভ্যতার কাহিনি পড়ব। মনে রাখতে হবে, নব্যপ্রস্তর যুগের এই পরিবর্তন হঠাৎ করে ঘটেনি। ধীরে ধীরে মানুষের কৃষিকাজ ও স্থায়ী আবাস তৈরি করা, বিভিন্ন প্রাণীকে পোষ মানানো, পশুপালন আর পশুচারণ শুরু হয়। ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র এই পরিবর্তন একই গতিতে, একই সময়ে ঘটেনি। কোথাও কোথাও সাধারণ ১৫০০ পূর্বাব্দেও নব্যপ্রস্তর যুগীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তেমনই অন্ততপক্ষে দুটি স্থান পাওয়া গেছে বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার চাকলাপুঞ্জী ও কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতিতে। বিস্ময়কর হলো এখান থেকে পাথরের হাতিয়ার পাওয়া যায়নি। বরং বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া পাথরের মতন শক্ত কাঠের তৈরি। এই ফসিল উডের হাতিয়ার সম্ভবত নব্যপ্রস্তর যুগে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশ, বর্তমান ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আরও পূর্বে বর্তমান মিয়ানমারের বিভিন্ন স্থানের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তৈরি ও ব্যবহার করত।



## ভারত উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় স্থানসমূহ



ভারত উপমহাদেশে প্রধান প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর ও মেগালিথিক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের অবস্থান

নবোপলীয় যুগের হাতিয়ারগুলো অনেক বেশি তীক্ষ্ণ এবং মসৃণ ছিল। ভাঙা ও মসৃণ পাথুরে হাতিয়ার, মাটি গর্ত করার ও ফসলে নিড়ানি দেওয়ার হাতিয়ার, কাস্তের মতন হাতিয়ার এবং লাঙলসহ নানা ধরনের নিত্যব্যবহার্য বস্তু ও জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। মানুষ মাটি ও বাঁশ-বেত-কাঠ দিয়েও নানা উপকরণ তৈরি করত। পরিধানের জন্য ও অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য কাপড়ও বুনতে শিখেছিল। কৃষিকাজ করতো বলে যে মানুষ শিকার করা ছেড়ে দিয়েছিল তা কিন্তু নয়। মানুষ মাংস-মাছ-ফলমূল-সবজি-ভাত-গম খেত বলেই অনুমান করা হয়।

নব্যপ্রস্তর যুগে চাকা আবিষ্কার করায় মানুষের পক্ষে যাতায়াত করা অনেক সহজ হলো। যোগাযোগের উন্নতির কারণে অল্প সময়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারত গরুর গাড়ির মতন বাহনে চেপে। বিভিন্ন স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ওপরে ভিত্তি করে মনে করা হয় যে, বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মানুষ পালন করত। তুরস্কের ধর্মাচরণের স্থাপত্যের মতন স্থাপত্য দুনিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলে না-পাওয়া গেলেও নানা ধরনের পোড়া মাটির, হাড়ের, হরিণ জাতীয় প্রাণীর শিংয়ের, পাথরের দ্রব্যাদি ও ভাস্কর্য সেই সময়ের সমাজে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রচলনের প্রমাণ বহন করে।

নব্যপ্রস্তর যুগের কৃষিকাজ ভিত্তির বসতিতে বসবাস করার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজে ফসল উৎপাদন করা শুরু করে। পশুপালন করা শুরু করে। ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ওই সময়ের বসতির বাড়িঘর কেমন ছিল সে-সম্পর্কে ধারণা করার মতন প্রমাণও পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয়, সে-সময় গোলাকার বা বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার ঘরবাড়ি বানানো হতো বাঁশ-বেত-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে। ফসল রাখার জন্য গোলাঘরও বানানো হতো।



বাংলাদেশের চাকলাপুঞ্জীতে প্রাপ্ত জীবাশ্ম কাঠের তৈরি নব্যপ্রস্তরযুগীয় হাতিয়ার

## ধাতুর আবিষ্কার ও পাথর-ধাতুর ব্যবহারের যুগ: তাম্রপ্রস্তর যুগ

নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ সভ্যতার প্রস্তুতিপর্বে তামা আবিষ্কৃত হয়। যদিও এ সময় মানুষ খনি থেকে তামার আকর সংগ্রহ করতে পারতো না। তবে প্রাপ্ত পাথরের গা থেকে তামার আকর নিয়ে তা উত্তপ্ত করে কাঁচা তামা বের করে আনতো। নবোপলীয় যুগের মানুষ তামার হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। পাথুরে অস্ত্রের পাশাপাশি তাম্র অস্ত্র ব্যবহৃত হতো বলে সময়টি তাম্রপ্রস্তর যুগ নামেও পরিচিত।

প্রস্তর যুগের সমাপ্তি এবং নগর সভ্যতার উন্মেষের মধ্যবর্তীকালে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ মানবজাতির অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল। পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চল প্রস্তরযুগের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটিয়ে নবতর উদ্ভাবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে। এ সময় মানুষ নিরেট প্রস্তর নয় তাদের জীবনকে গতিশীল করার জন্য ধাতুর ব্যবহার করায়ত্ত করে। নবোপলীয় যুগের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আরও বেশি ক্রিয়াশীল ধাতু তামার আবিষ্কার করে। তামা আবিষ্কারের পথ ধরেই মানুষ উদ্ভাবন করে ব্রোঞ্জ। তামা আর টিনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়। ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণাংশ থেকে বিভিন্ন তাম্রপ্রস্তর যুগীয় হাতিয়ার এবং বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে।



ভারত উপমহাদেশের তাম্রপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির অবস্থান



ভারত উপমহাদেশের উত্তরাংশে প্রাপ্ত তাম্রপ্রস্তর যুগের কয়েকটি হাতিয়ার ও নিদর্শন



প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যেসব গ্রামীণ  
বসতি আবিষ্কার করেছেন,  
তা থেকে ধারণা করা হয়  
গ্রামগুলো সুবিন্যস্ত ঘর দিয়ে  
গঠিত হতো। ঘরের মাঝখানে  
আঙিনা থাকতো। গর্ত করে  
শস্যাগার বানানো হয়েছিল।  
তামার আবিষ্কার মানুষের  
ইতিহাসে আরেকটি বড় ঘটনা  
হওয়ায় সেই ঘটনা তৎকালীন  
ও পরবর্তী জীবন, উৎপাদন,  
সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে বদল  
নিয়ে এসেছিল। ব্রোঞ্জযুগীয়  
সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে  
মানুষের তামার ব্যবহার করতে  
শেখাটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক  
হিসেবে কাজ করেছিল।



তামা নিক্ষেপনের কল্পিত দৃশ্য

নব্যপ্রস্তর যুগীয়  
একটি বসতি বা গ্রাম।  
মানুষজন কী কী কাজ  
করছেন তা চিহ্নিত  
করতে পারো? তোমার  
গ্রামে কোন কোন  
ধরনের কাজ চারপাশের  
মানুষজন করেন? ।



তুরস্কের আনাতোলিয়া অঞ্চলের  
নব্যপ্রস্তর যুগীয় একটি পরিকল্পিত বসতি  
চাতালহাইউক।



মানুষ হয়ে ওঠাটা তাহলে কেবলই দৈহিক ছিল না। মানুষের শারীরবৃত্তীয় বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সংস্কৃতি, উৎপাদন, পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণগত পরিবর্তনও ধীরে ধীরে ঘটেছে। সাধারণ ৬৫০০০ পূর্বাব্দের আগে বা পরে আধুনিক মানুষের অভিবাসন ভারত উপমহাদেশে ঘটেছিল। তার আগেও এখানে আধুনিক সেপিয়েন্স প্রজাতির পূর্বসূরীরা বসবাস করতো। কিন্তু ধীরে ধীরে জলবায়ুগত, প্রযুক্তিগত, উৎপাদনগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সেপিয়েন্সরা টিকে থাকতে পেরেছে। অন্য প্রজাতির মানুষ বিলুপ্ত হয়েছে। নানা সময়ে মানুষ আফ্রিকা থেকে নানা পথে ভারত উপমহাদেশে এসেছে। ভারত উপমহাদেশ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন যুগে মানুষের আগমনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রজাতিগুলোর সঙ্গে আগত প্রজাতির সংমিশ্রণও ঘটেছে। এই সংমিশ্রণ পরবর্তী সময়ে আরও চলবে। বর্তমান ইরান ও আশপাশের এলাকা থেকে একদল মানুষ ৬০০০-৫০০০ সাধারণ পূর্বাব্দের সময় বর্তমান ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে আগমন করে। ইতোমধ্যে বসতি তৈরি করা তুলনামূলকভাবে বেশিসংখ্যক স্থানীয় সেপিয়েন্সের সঙ্গে আগত সেপিয়েন্সদের মিশ্রণের ফলে যে মানুষগুলো সৃষ্টি হলো, তারাই পরে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। গড়ে তুলেছিল শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থা। সেই আলাপ আমরা পরের অধ্যায়গুলোতে করবো।

### প্রাচীন মানুষের জীবন নিয়ে নাটক

এতক্ষণ আমরা সভ্যতা বিকাশের পথে প্রাচীন মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে পড়েছি। এখন চলো সবাই দলে ভাগ হয়ে এই যুগগুলো থেকে একেকটি যুগ নিয়ে একেকটি দল কাজ করি। কোন দল কোন কাল নিয়ে কাজ করবে, তা আগে থেকেই চলো ঠিক করে নেই।

এরপর নিজ নিজ দলের মধ্যে ওই যুগ সম্পর্কে আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি যুগের মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক খুব ভালো করে চিহ্নিত করি। তারপর তাদের জীবন যাপনের ধরন অনুযায়ী প্রতিটি গ্রুপ একটি করে ছোট নাটক রচনা করি। এতে প্রাচীন মানুষেরা কীভাবে খাবার সংগ্রহ করত, শিকার করত, কেমন পোশাক পড়ত বা কোথায় থাকত ইত্যাদি যতো রকমের তথ্য জোগাড় করা সম্ভব তার সবকিছুই রাখার চেষ্টা করি।

তারপর সেই নাটক কোনো নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শন করি। নাটকে যে যুগকে তুলে ধরা হচ্ছে সেই সময়ের মানুষের মতো মুখোশ, পোশাক, হাতিয়ার ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন সেই সময়কে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।